গোপনীয়তার নেই মালিকানা

অংশুমান ভৌমিক

আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা আমায় চেয়ো না রাধা
আমি নই শ্যাম
হারিয়েছি বাঁশিখানা হয়ে গেছি তালকানা
ভুলে গেছি নাম।
—কবির সুমন ('ছুটি ড কম')।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১১। রোজ সকালে চায়ের কাপে চুমুর দিতে দিতে খবর কাগজের হেডলাইনে চোখ বোলানোর মৌতাতকে থমকে দিয়েছিল একটি হেডিং। আত্মহত্যা করেছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (বেঙ্গালুরু) -এর ছাত্রী মালিনী মুর্মু। ২৩ বছরের মালিনীর বাড়ি জামশেদপুরে। বাবা বিশ্বনাথ মুর্মু এইচপিসিএল -এর পদস্থ আধিকারিক। লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো মেয়েটি। ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি থেকে বি টেক পাশ দেবার পর কিছুদিন ইনফোসিসে কাজ করেছিলেন। এ বছরের জুন মাসে আইআইএম (বেঙ্গালুরু) -এ ভর্তি হন। হোস্টেলে থাকতেন।

ক'দিন ধরে মালিনীর মন খারাপ। বিকেলবেলায় তার ঘর ভেতর থেকে আটকানো ছিল। সাড়াশব্দ নেই। মোবাইলেও পাওয়া যাচ্ছে না। বন্ধুদের কপালে ভাঁজ পড়ে। খবর পাঠানো হয় হোস্টেলের নিরাপত্তার কর্মীদের কাছে। দরজা ভাঙা হয়। হোস্টেলের ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় মালিনীকে। সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়েছিলেন তিনি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, মালিনীর আত্মহননের পেছনে আছে একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে প্রকাশিত একটি ঘোষণা। কীসের ঘোষণা? কার ঘোষণা?

জানা যাচ্ছে, মালিনীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিলো অভিষেক ধন নামে একটি ছেলের। কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকেন অভিষেক। কিছুদিন আগেই বেঙ্গালুরু এসেছিলেন। সে সময় মালিনীর সঙ্গে তুলকালাম ঝগড়া হয় তাঁর। দিল্লিতে ফিরে যান অভিষেক। ক'দিন আগে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে স্টেটাস বদলেছেন তিনি। ছিলেন কমিটেড, এখন তিনি সিঙ্গল হয়েছেন। একই সঙ্গে একটি পোস্ট করেছেন নিজের ওয়াল-এ। তাতে তিনি লেখেন— ফিলিং সুপার কুল টুডে। ডাম্পড মাই নিউ এক্স - গার্লফ্রেন্ড। হ্যাপি ইনডিপেনডেন্স ডে! মালিনীর বন্ধুরা বলেছেন, এ ভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে বড়াই করার ব্যাপারটা মন থেকে নিতে পারেননি মালিনী। সবার চোখে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন। তাই রাতারাতি নিজের জীবনে যবনিকা টেনে দেবার মতো গুরুতর সিদ্ধান্ত নেন। হাতে লেখা কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। তন্নতন্ন করে মালিনীর ল্যাপটপ ঘেঁটেছেন গোয়েন্দারা। তাতেও কিছু নেই। তবে হোস্টেলের ঘরে একটি হোয়াইট বোর্ড আছে। মার্কার পেন দিয়ে মালিনী তাতে লিখে রেখেছিলেন— হি ডিচ্‌ড মি। ও আমায় ঠকিয়েছে। ওই হোয়াইট বোর্ডে এমন আরও কিছু শব্দ লিখেছিলেন মালিনী যেগুলি নারীকে অবমাননা করতে অসংবেদনশীল পুরুষেরা ব্যবহার করে থাকেন। এমন ১০-১২টি শব্দ হোয়াইট বোর্ডে লেখা ছিল। তার নিচে ছিল মালিনীর একটি মন্তব্য— ওয়ার্স্ট পার্সন এভার। আই হেট ইউ। আরও ছিল: রিভেঞ্জ ইজ বেস্ট সার্ভড হোয়েন ইট ইজ কোল্ড। এছাড়াও ওই ঘরে পাওয়া গেছে অভিষেকের ফেসবুক স্টেটাস মেসেজের একটি প্রিন্ট আউট। এতে করে আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। বেঙ্গালুরু পুলিশের খাতায় অভিযোগ জমা করেছেন মালিনীর শোকার্ত বাবা বিশ্বনাথ মৃতদেহ নিয়ে জামশেদপুর ফিরে যাবার আগে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেবার জন্য মালিনীর প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে আমার মেয়েকে, বলেছেন তিনি। অভিষেক ফেরার। নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছেন তিনি। পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। দিল্লিতে লোক পাঠানো হয়েছে। ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ৩০৬ ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অভিষেকের এ ধরনের কথাবার্তা, আচরণ মালিনীকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছে। আইআইএম (বেঙ্গালুরু)-র পক্ষ থেকে একটি প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে— ইউ হ্যাভ লাস্ট আ ব্রাইট ইয়াং পার্সন ইন দ্য প্রাইম অফ হার লাইফ।

বাকি ইতিহাস?

জানবার জন্য মালিনী মুর্মুর ফেসবুক প্রোফাইল খুলেছিলাম। তখনও চালু আছে পেজ। একের পর এক পোস্ট জমা হয়েছে। শোকবার্তা। সমবেদনায় উন্ন। তাতে কি হয়েছে। এই প্রোফাইল থেকেই পড়ে নেওয়া যায় মালিনীকে। মালিনীর মতো আরও অনেককে।

প্রথমেই যা হতবাক করেছিল তা মালিনীর অ্যাটিটিউড। প্রোফাইল পিকচারে উচ্ছ্বসিত এক যুবতী। সপ্রতিভ। আত্মবিশ্বাসী, আহ্লাদেপনা নেই এ কথা বলা যাবে না, কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ফুটে বেরচ্ছে নিজের জীবনের রাশ নিজের হাতে তুলে নেওয়ার স্পর্ধা। পেছনে একটি সুবেশ পুরুষের আবছা আদল। মনে হয় কোনও ছোটেখাটো পার্টিতে তোলা ছবি। এই শ্যামলীর পরনে একটি ফ্যাশনেবেল কালো পোশাক। কেশচর্চায় যে বিশেষ আগ্রহ রাখেন তিনি, তা কাঁধের কূল ছাপিয়ে বুকের ওপর সুবিন্যস্ত স্ট্রেট হেয়ারের বিন্যাসে স্পষ্ট। হাতে একটি গেলাস। প্লাস্টিকের। সফট ড্রিংকের, সম্ভবত। থেকে থেকে চোখ আটকে যায় শ্যামলীর চোখে। ঈষৎ লাজুক সেই চোখের তারায় বিষাদ আছে? নেই। আপাতভাবে, নেই।

আপওয়ার্ডলি মোবাইল যে উচ্চমধ্যবিত্ত এ দেশের নীতিনির্ধারকদের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করেন, মালিনী মুর্মুকে তাঁদের দলে ফেলাই যায়। নামে মিল থাকতে পারে, কিন্তু মালিনীকে চুনি কোটালের পংক্তিভুক্ত করা যাবে না। প্রোফাইল খুঁড়ে জানা যাচ্ছে, মালিনীর মাতৃভাষা সাঁওতালি। এই ভাষায় সড়গড় তিনি। ইংরেজি, হিন্দি ক্ষমতার ভাষা হতে পারে। কিন্তু পাবলিক ফোরামে নিজের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে আড়াল করার মেয়ে ছিলেন না মালিনী। এ পরিচয় তাঁর অহংকার ছিল। যে জগতে তাঁর ওঠাবসা, সে জগতে এই পরিচিতি নেতিবাচক হতে পারে জেনেও, রক্তের ঋণকে তিনি অস্বীকার করেননি। এই শ্লাঘনীয় ঘোষণা এক গভীর আত্মমর্যাদাবোধকেও সূচিত করেছিল।

ফেসবুক -এ নিত্যকার আনাগোনা ছিল মালিনীর। বন্ধু সংখ্যা ৭২৬। ফেসবুক -এর দুনিয়ার একটু আধটু হালহদিশ যাঁরা রাখেন,

তাঁরা হলফ করে বলতে পারবেন, ৭২৬ সংখ্যাটা আর যাই হোক কোন অন্তর্মুখী স্বভাবের মেয়ের দিকে আঙুল তোলে না। ফেসবুক প্রোফাইল থেকেই জানতে পারলাম যে মালিনী চেতন ভগতের অনুরাগী ছিলেন। এই সেই 'ফাইভ পয়েন্ট সামওয়ান' -এর লেখক চেতন ভগৎ যাঁর বেস্ট সেলার ভাহিয়ে মালিনীদের প্রজন্মের অভীপ্সার প্রতীক 'থ্রি ইডিয়ট্' তৈরি করেছেন বলিউড নির্মাতারা। মালিনীর প্রিয় লিস্টিতে ছিল 'উড়ান'। জামশেদপুরের একটি সাদামাটা ছেলের বড় হয়ে ওঠার গল্পের মধ্যে নিজেকে পেতেন তিনি। কিন্তু খালি বলিউড নয়, বিদেশি সিনেমাও দেখতেন। প্রিয় সিনেমার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার রোম্যান্টিক ব্লকবাস্টার 'মাই স্যাসি গার্ল'ও আছে। নাচতে ভালোবাসতেন মালিনী। টেলিভিশনের হরেকরকম ডান্স রিয়্যালিটি শো-র পোকা ছিলেন। ইদানীং মনে ধরেছিল টিনএজ পপ সেনসেশন মিলি সাইরাসকে। গাইতেও জানতেন। গিটার হাতেও দেখা যেত তাঁকে। বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে হই-হুল্লোড়ে বেরতে দু'বার ভাবতেন না। একাকিত্ব তাঁর সহজাত নয়। অবসাদ তাঁকে গ্রাস করার আগে একশোবার ভাববে। পেশাগত সাফল্য তাঁকে তুড়িলাফ দিতে দিতে জামশেদপুর থেকে বেঙ্গালুরুতে এনে ফেলেছিল।

তবু কোন গভীর অসুখের শিকার হলেন মালিনী মুর্মু? এমন ভাঙাগড়া তো কতই হয়। রোজই হচ্ছে। সেকেন্ডে - সেকেন্ডে হচ্ছে। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রত্যাঘাত করার ঘটনা ভুরি ভুরি। আত্মহত্যাও দুর্লভ নয়। যারা সেই চরম পথের পন্থী তাদের মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়। যথা, অন্তর্মুখী স্বভাব, পারিবারিক নিরাপত্তহীনতা, অনুভূতিপ্রবণতা ও অতিসংবেদনশীলতা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইয়ারদোস্তদের কবচকুণ্ডলও থাকে না এই চরমপন্থীদের। মালিনী মুর্মুর সঙ্গে এই স্টিরিওটাইপ মিলছে না। তাই খুঁতো চোখ মেলতে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায়। ফেসবুক-এর পাতায় বিগত বালক বন্ধুটির উচ্ছ্বাসই ভাসিয়ে দিয়ে গেছে মালিনীকে। হাটে হাঁড়ি ভাঙার অনেক রকমফের আছে। যেমন আছে মোহব্বত কবুল করার। শোলে সিনেমায় বীরু (ধর্মেন্দ্র-অভিনীত চরিত্র) এক জলের ট্যাঙ্কের টঙে উঠে আত্মহত্যার তামাশা করছিল। শুনেছিল হাজারো গাঁওয়ালো। তার সেই তামাশার মূলে প্রেমাস্পদের প্রত্যাখ্যান ছিল না। মালিনী প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তা বটেই, সামাজিকভাবেও। সেই সমাজ, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার নাম সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। সংকীর্ণ অর্থে ফেসবুক।

মন খেরোর খাতা

বছর তিনেক আগে আর পাঁচজনের মতো ফেসবুক -এর দুনিয়ায় যখন প্রথম লগ ইন করি, বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম নাট্যকার তথা চলচ্চিত্রকার সলিল সরকারকে। রোম্যান্টিক মানুষটি ফেসবুকের একটি বাংলা নাম দিয়েছিলেন, 'মন খেরোর খাতা'। খেয়াল করেছিলাম, কীভাবে খেরোর খাতার নিত্যনৈমিত্তিকতার সঙ্গে মনের মাখামাখি হয়ে গেছে। খেরোর খাতায় কি মন থাকে না? সত্যজিতের সিনেমার গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী তাঁর খেরোর খাতা। তাতে কি তাঁর মন ছিল না? ছিল তো। তবে মনকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর মেধা, তাঁর মগজ। ফেসবুক তার ইউজারদের মনের জানালা ধরে বন্ধুবান্ধবদের অন্দরমহলে উঁকি দিয়ে যায়। এ দেশে আসার আগেই এই গুণটি সে রপ্ত করেছিল। এভাবেই এ দেশের ফেসবুক -এর সঙ্গে সই পাতিয়েছিল।

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/ সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। এই কথাটি টাইপ করে ঝটিপটি ফেসবুক -এর পাতায় পোস্ট করে দিলে কপিরাইটের বাবার সাধ্যি নেই আমায় কিছু বলে! কথাটা আমার হয়ে যায়। হয়তো চালিয়াতি করে বলা। হয়তো হঠাৎ মাথায় খেলে যাওয়া, তাই বলা। হয়তো ওসব কিছু নয়, এমনি এমনি বলা। ইচ্ছে করে বলা, যাতে কথাটা শুনে কে কী বলে যাচাই করে নেওয়া যায়। কিংবা সারাদিনের অবিরাম আলাপনের খেই ধরিয়ে দেবার ছুতো, একটু খুঁচিয়ে দেওয়া, এই মাত্র! পোস্ট করা মাত্র লাইক-ডিজলাইকের সিলসিলা জারি। কেউ একটু ফক্কুরি করল, কেউ ফক্কিকারি। কেউ পিঠ চাপড়ে দিল, সাবাশ! ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দিতে। সুশীল, অশ্লীল সব জবানে। সবটাই সিন্ধ, সবই চলে। এখানে কেউ চোখ রাঙায় না, আমি না চাইলে অন্যের কথা পোস্ট কেউ মুছে দিতে পারে না। একটি কথার দ্বিধাথরথর চুড়ে সাতটি অমরাবতী রচনা হয়ে যায়। এমন অনেকে ফেসবুক -এ আসেন যাঁরা অষ্টপ্রহর ধরে কী করেছেন, কী ভাবছেন, কী পড়ছেন, কী শুনেছেন, কী দেখেছেন সব কিছুর আঁখো দেখা হাল দিয়ে চলেন। পাম্পির হাতে মর্নিং টি, মুখে হাসি, আজকের দিনটা ভালো যাবে। চান করে এলুম, চিরুনি কোথায়, সব্বোনাশ! মমতার মা আসেনি, আজ বউ বাসন মাজতে বলেছে। শুনব না এফ এম, শুনব না। একেকটা পোস্ট, একশোটা রেসপন্স। যার যত জানাশুনো, তার তত জবাবা। জবাব, পাল্টা জবাব। এভাবে জমে যায় ফেসবুক। কাজকম্মে মাথায় তুলে সারাদিনমান বকরবকর। কাজের ফাঁকে একটু জিরোনো। কতটা কানেকটেড একটু যাচিয়ে নেওয়া। নাহলে কানেকটেড হয়ে ওঠা। নইলে মুখ ভার। দলছুট। একলা হয়ে যাওয়া। সবার কাছে নিজেকে কাঙ্ক্ষিত করে তোলার মধ্যে নিজেকে গঞ্জের হাটে নিলামে তোলার মিল আছে। ফেসবুক -এ কেউ কেউ সেটাই করেন। করে আত্মপ্রসাদ পান, কলার নাচান, নাকের পাটা ফোলান। কেউ মন খারাপ করেন। কারও দুটোই হয়, একে একে।

অনেক দিন আগে, ঠিকঠাক পনেরো বছর আগে, ভালোবাসাকে আর্চিজ গ্যালারি সমার্থক করে তুলেছিল 'পরশপাথর' নামের একটি বাংলা ব্যান্ড। দশ বছর হতে চলল 'পরশপাথর' উঠে গেছে। কিন্তু ওই অত্যাশ্চর্য সমীকরণটি অনেকে ভোলেননি। যাঁরা আজও শোনেন, প্রথমবার, তারাও ভোলেন না। অরকুট-ফেসবুক-এর বেলায় এমন সমীকরণ রচনার চেষ্টা কেউ করেছেন বলে শুনিনি। করতেই পারেন। তবে এই সমীকরণটি দ্বিঘাত না হয়ে যায় না। সাধারণ বজ্রগুণন, একান্তর বা অপনয়ন প্রক্রিয়ায় এর হদিশ বার করা শক্ত। কারণ, ফেসবুক অনেকান্ত। বিভিন্ন বয়সের কাছে এর আবেদন বিভিন্ন। ফেসবুক কারও কাছে অফুরন্ত আড্ডার আহ্বান। রকের আড্ডা, কমন রুমের আড্ডার ভার্চুয়াল পরিবর্তন এবং আরও অনেক কিছু। পরিচিত একজন শিক্ষিকা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। গোড়ায় বন্ধুরাই দলে ভারী হলেন। ক'দিন যেতেই ছাত্রছাত্রীরা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে শুরু করল। একজনকে অ্যাকসেপ্ট করলেন অন্যজনকে রিজেক্ট করা কঠিন। ক্রমশ লম্বা হতে থাকল লিস্ট। বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা তাদের সিক্রেট আন্টির সঙ্গে শেয়ার করতে গেল। আন্টিও আশকারা দিলেন। মাসখানেকের মধ্যে আন্টির ব্যক্তিজীবন ছেলেমেয়েদের পড়া হয়ে গেল। অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। সবাই এই শিক্ষিকার মতো মাত্রাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় ভোগেন না। সম্পর্কে যতিচিহ্নের প্রয়োগ জানেন। আমার এক মাস্টারমশাই তাঁর সত্তরোর্ধ্ব নিঃসঙ্গ জীবনে দেশ - বিদেশে ছড়িয়ে - ছিটিয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আড্ডা দেন। ছেচল্লিশের কোনও গৃহবধূ স্যারের আশীর্বাদ পেলে বর্তে যান, ছত্রিশের মার্কেটিং এগজিকিউটিভ স্যারের কাছে সহবত শিক্ষা করেন। এমন কোনও কোনও মানুষের কাছে ফেসবুক হল অন্ধের যষ্টি। ভঙ্গুর একটি অবলম্বন, যার আসা আর যাওয়ার মধ্যে

সর্বসাকুল্যে কয়েকশো কিলোবাউটের তারতম্য, এর বেশি নয়। দুটো পয়সা ফেললেই এই যাওয়া - আসার স্রোতের ভাষা যানা যায়। আবার এমন মানুষকেও জানি, যাঁর প্রৌঢ়া মাতা ফেসবুক -এ অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, তিনি খোলেননি। কেন? না তাঁর মনে হয়েছে, এভাবে বন্ধুতা হয় না। যারা সত্যিকারের বন্ধু তারা ফেসবুক -এর আগেও ছিল, পরেও থাকবে। নেটওয়াকিং সবার জন্য নয়। তাঁর চাই নিভৃত নির্জন চারিধার। ফেসবুক বড় কোলাহলের।

দশে মিলি নানা রূপ

এ তো গেল সোশ্যাল মিডিয়ার মুখ্য কুলীন ফেসবুক-এর এক মুখ। সোশ্যাল নেটওয়াকিং -এর ছাঁচে এই মুখ ঢালাই করা। বলা বাহুল্য, এটাই ফেসবুক-এর একমাত্র মুখ নয়। এর বাইরেও অনেক মুখ আছে। কে না জানেন, ফেসবুক -এর পাতায় কমিউনিটি গড়ে কত গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে গত কয়েক বছরে! এ বছরের কথাই ধরুন না কেন। আন্না হাজারের আন্দোলনের পেছনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আহাম্মকির অবদান আছে, ফেসবুক-এরও আছে। তাহ্‌রির স্কোয়ার থেকে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট, সব গণ-আন্দোলনে অনুঘটক ফেসবুক-এর মতো সোস্যাল নেটওয়াকিং সাইট। এখানে ব্যক্তিমুখ আছে। আবার সমষ্টির আড়ালও আছে। এখানেও গুচ্ছ-গুচ্ছ পোস্টিং হয়। মতামত গড়ে ওঠে। সিদ্ধন্তের নির্মাণ - বিনির্মাণ হয়। মাথা চুলকোতে থাকনে কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং। তাল ঠোকেন কীভাবে বাগে আনাবেন জনমতকে! স্তব্ধ করবেন বিরুদ্ধ স্বরকে। চীনের কালচার পুলিশ শুনলাম সে দেশের টুইটারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কী অপরাধে ধর্মাবতার? টুইটারেত্তিরা নাকি গুজব ছড়াচ্ছিলেন। বেআইনি জনসংযোগ গড়ে তোলার কসুরে ৬৬০০ ওয়েবসাইটকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আধা - সমাজতান্ত্রিক চিনে। গণতান্ত্রিক ভারতের আইনে আটকাচ্ছে, নইলে দিগ্বিজয় সিংদের মুখে হাসি ফুটত।

এ রাজ্যের তো বটেই, এ দেশে অনেক কেউকেটা ফেসবুক-এ হরদম আসছেন - যাচ্ছেন। ভারচুয়াল ওয়ার্ল্ডে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এর ফলে বাড়ছে বই কমছে না। কেউকেটা হবার বিপদও আছে। শশী থারুরের কথা ভেলেননি নিশ্চয়? নামজাদা ঔপন্যাসিক। রাষ্ট্রপুঞ্জের বড় কর্তা ছিলেন। লোকসভা ভোটে জিতলেন। স্বভূমি কেরল থেকে সাংসদ হলেন। মেঘ না চাইতে জলের মতো দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের মন্ত্রিত্বও এল শশীর কাছে। ওদিকে টুইটারের নেশা পেয়ে বসেছিল বিদেশমন্ত্রকের এক রাষ্ট্রমন্ত্রীকে। মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছেন অথচ ঘরের বাইরের হরেকরকমবা নিয়ে টুইটারের বুক টীয়াটিপ্পনি না দিতে পারলে রাতে ঘুম হচ্ছিল না শশীর। দাদা মন্ত্রীরা ভাই মন্ত্রীকে সামলাতে জেরবার। শেষটায় স্ত্রী সুনন্দা পুস্করের নাম জড়িয়ে আইপিএল-এর কোটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে টাকা ও প্রভাব খাটানোর দায় ঘাড়ে চাপতে দাদারা দেখলেন, আর নয়। মানে মানে মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে হল শশীকে। রাঘববোয়ালদের এই দশা যেখানে সেখানে চুনোপুঁটিরা তো কোন ছার! ২৫ সেপ্টেম্বরের খবরের কাগজে, দেখলাম, ফেসবুক -এর পাতায় বিহার বিধান পরিষদের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তকে কাটাছেঁড়া করায় সাসপেন্ড হয়েছেন পরিষদের দুই সদস্য। এঁদের একজন অরুণ নারায়ণ, ফেসবুক -এ লিখেছিলেন, নীতীশ কুমারের গণতন্ত্রে বিরোধিতা করা মানে ওঁর তৈরি করা ফ্যাসিবাদে শহিদ হয়ে যাওয়া। কথাটা রাষ্ট্র হতেই সাসপেন্ড হয়েছেন তিনি। স্বয়ং চেয়ারম্যান জনতা দল ইউনাইটেডের প্রতি পক্ষপাত করেছেন, এমন মন্তব্য লেখায় সেই চেয়ারম্যান তাঁকে সাসপেণ্ড করেছেন। হতাশ অরুণ নারায়ণ বলেছিলো, আমরা তো নাগরিকও। স্যোসাল নেটওয়ার্কিংও -এও সরকার নজরদারি চালাবে! তাঁর জানা ছিল না, সোশ্যাল নেটওয়াকিং আর যাই হোক একটি পাবলিক ফোরাম। সেখানে কেউকেটা কেউ বেফাঁস কথা বললে তা থেকে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। তাই সার্ভেইল্যান্স সোসাইটি সব জায়গায় নজরদারি চালায়। রাষ্ট্রদ্রোহের সম্ভাবনা দেখলেই আড়ি পাতে।

গান্ধীবাদী সমাজকর্মী হিমাংশু কুমার ফেসবুক-এ আছেন। ক'বছর আগে ছত্রিসগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় তাঁর তিল তিল করে গড়ে তোলা বনবাসী চেতনা আশ্রম পুলিশের বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেছে। সে রাজ্যে ঢুকলেই তাঁকে গারদে পুরবে পুলিশ। অগত্যা দিল্লিতে এসে উঠেছেন হিমাংশু। ফেসবুক-এ তাঁর সখ্য আছে স্বামী অগ্নিবেশ, অরুন্ধতী রায়, তিস্তা শীতলবাদ সবার সঙ্গে। রাষ্ট্র যে তাঁর অ্যাকাউন্টে নিয়মিত চোখ রাখছে তা তিনি বিলক্ষণ জানেন। তারই মধ্যে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সপক্ষে লড়াই চলে তাঁর। গোধরায় নরমেধ যজ্ঞের পর এক প্রতিবাদী আইএএস অফিসার পদত্যাগ করেছিলেন। মনে পড়ে? হর্ষ মান্দার। এখনও সক্রিয় সজাগ তিনি। 'দ্য হিন্দু'র পাতায় অনেক মর্মভেদী অনুসন্ধিৎসু ফিচার লেখেন। তার কোনওটায় রাষ্ট্রনীতিকে তুলোধোনা করা হয়। সরকারি চাকরিতে থাকলে এত হাত খুলে লিখতে পারতেন না হর্ষ। ফেসবুক-এ তো নয়ই।

'দ্য হিন্দু'-র কথা উঠতে গত ৩০ অক্টোবর ওই কাগজের পাতায় বেরনো একটি চার কলামের মাঝারি মাপের খবর মনে এল। ওয়াশিংটন থেকে জনৈক নারায়ণ লক্ষ্মণ লিখেছেন— ডিজিটাল মিডিয়া কি মার্কিন দেশের বৈদেশিক নীতির হাতিয়ার? খবরটির শিরোনামেই বারুদের গন্ধ ছিল। ভেতরে ঢুকতে আরও বিস্ময়। মার্কিন ব্যুরো অফ আর্মস কন্ট্রোল ভেরিফিকেশন অ্যান্ড কমপ্লায়েন্সের সহ-সচিব রোজ গোটমোলার। ভদ্রমহিলা সম্প্রতি স্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন একটি ভাষণ দিতে। ভাষণে তিনি বলেছেন যে পাকিস্তানে সন্তর্পণে পরমাণু গবেষণার হাঁড়ির খবর থেকে শুরু করে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলির পতন— এসবই আঁচ করতে পারছেন তাঁরা। সৌজন্যে ফেসবুক-এর মতো সোশ্যাল মিডিয়া। কম্পিউটার আর ইন্টারনেট কানেকশন থাকলেই পাক দেশের খুশব পরমাণুচুল্লির খাস খবর জানা যাচ্ছে। ইন্টারনেটে হাজার-হাজার সফটওয়্যার পাওয়া যায়। মুফতে। সে সব ইস্তেমাল করে মনটারে ইনস্টিটিউটের এক স্নাতক স্তরের ছাত্র খুশব প্লুটোনিয়াম প্রোডাকশন কমপ্লেক্সের হাল-হকিকত জেনে ফেলেছেন। এতে খুব সুবিধা হয়েছে মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের। ইউনিভাসিটি অফ সার্দান ক্যালিফোর্নিয়ার এক ছাত্র আর এক কাঠি সরেস। টুইটার থেকে সে আরব দুনিয়ার আঁতের খবর সংক্রান্ত বিপুল এক তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। সে মুলুকে বসন্তের যে মরসুম এসেছে বলে প্রথম বিশ্ব প্রচার

> **যেভাবে একদিন একটি মুভি ক্যামেরা হাতে করে গোপনে চিলিতে ঢুকে পরেছিলেন মিগেল লিতিন, হয়ে উঠেছিলেন গাব্রিয়েল গার্থিয়া মার্কেজের উপন্যাসের অবলম্বন, সেভাবে ছত্রিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলার আদিবাসী মহল্লায় ঢুকে পড়েছিলেন লিঙ্গরাম কোড়োপি। পায়ে পায়ে গিয়েছিলেন সেইসব গ্রামে সেখানে তিনি জন্মেছেন। যেখানে আধা-সামরিক বাহিনীর হাতে তিনটি গ্রাম ছারখার হবার পর সিবিআইকে তদন্তের ভার দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। গোপনে গ্রামে ঢুকে জবানবন্দি রেকর্ড করেন লিঙ্গরাম। কিছুদিনের মধ্যেই সেইসব জবানবন্দি উঠে আসে ইউ টিউবের পর্দায়।**

করেছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে তার সংকলনে। আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যে ত্রিপোলি গদ্দাফি বাহিনীর হাতছাড়া হচ্ছে, এ

কথাও নির্ভুলভাবে বাতলে দিয়েছিল সে। সে কারণে চীন টুইটারের ঘাড়ে কোপ মেরেছে, সেই কারণেই তাকে জামাই আদরে রাখছে মার্কিন দেশ।

ভারত কী করবে? অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অবস্থা খুব ভালো নয়। নানান ওজরে নানান অজুহাতে দমনপীড়নমূলক নানান বিশেষ আইনে দেশটাকে বজ্র আঁটুনিতে রাখতে চাইছে ভারত রাষ্ট্র। জঙ্গলমহলের বিস্তৃত এলাকা 'একক মাত্রা'র পাঠকদের আওতার বাইরে। শত চাইলেও সে তল্লাটে পা ফেলবার অনুমতি দেবে না যৌথ বাহিনী। যেভাবে একদিন একটি মুভি ক্যামেরা হাতে করে গোপনে চিলিতে ঢুকে পড়েছিলেন মিগেল লিতিন, হয়ে উঠেছিলেন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের উপন্যাসের অবলম্বন, সেভাবে ছত্রিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় আদিবাসী মহল্লায় ঢুকে পড়েছিলেন লিঙ্গরাম কোড়োপি। পায়ে পায়ে গিয়েছিলেন সেইসব গ্রামে যেখানে তিনি জন্মেছেন। যেখানে আধাসামরিক বাহিনীর হাতে তিনটি গ্রাম ছারখার হবার পর সিবিআইকে তদন্তের ভার দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।। গোপনে গ্রামে ঢুকে জবানবন্দি রেকর্ড করেন লিঙ্গরাম। কিছুদিনের মধ্যেই সেইসব জবানবন্দি উঠে আসে ইউ টিভির পর্দায়। মানবাধিকারের লাঞ্ছনার নিষ্করুণ ধারাভাষ্য উঠে আসে কম্পিউটার স্ক্রিনে। কী হবে যদি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র এভাবে বেলপাহাড়ির - গোয়ালতোড়ের আদিবাসীদের ক্যামেরার সামনে কথা বলাতে পারেন? গোপনে। কী হবে যদি সেই ছায়াছবি অনেক ঢেকে রাখা কথাকে উদোম করে দেয়, যদি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের একটি নগ্ন রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে যায়? কী হবে যদি সেই ভিডিও আপলোড ইউ টিউব থেকে ফেসবুক-এ ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবাদের আগুন? বিদ্রোহ চনমনিয়ে ওঠে —ইমেল -এ, এসএমএস-এ ইয়াহু মেসেঞ্জারে, জি-টকে? রাষ্ট্রকে সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর খবরদারি করতেই হয় তার নিজের অস্তিত্বের প্রয়োজনে, হেজিমনিকে নিরঙ্কুশ রাখতে।

'মুঝসে ফ্রান্ডশিপ করোগে'

সমাজতাত্ত্বিকদের এলাকায় ঢুকে পড়ার বিপজ্জনক প্রলোভনকে সামলে ফিরে আসা যাক মালিনীর কথায়। এই মালিনী ও তার প্রজন্মকে নিয়ে পপুলার কালচার ভাবছে। ফেসবুক যুগের ফেসবুক যুবাদের কীভাবে বাণিজ্যলক্ষ্মীর মধুর ডিঙায় জড়ানো যায় তা নিয়ে কর্পোরেট ভাবছে। এরই একটি প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে যশরাজ ফিল্মসের একটি সিনেমায়- মুঝসে ফ্রান্ডশিপ করোগে। না, ছাপার ভুল নয়, ছবিতে ফ্রেন্ডশিব নয়, ফ্রান্ডশিপের জয়জয়কার। এই ফ্রান্ডশিপের মাধ্যমে ফেসবুক।

১৪ অক্টোবর দেশ জুড়ে মুক্তি পাওয়া 'মুঝসে ফ্রান্ডশিপ করোগে' সিনেমার ভাষায় রমকম, কলেজ রোমান্স। দিদি সমালোচকদের চলতি লবজে একটি হল একটি বাবালোগ ফিল্ম। এই সিনেমায় কলেজ আছে, ক্লাসরুম নেই। সেমিস্টার আছে, টেক্সট বুক নেই। এই কলেজে সবাই হাল ফ্যাশানের জামাকাপড় পরে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ওমুক ছেলেটি একটি মেয়েকে পছন্দ করে। মেয়েটি আবার তমুক ছেলেটির জন্য হেদিয়ে মরে। ফেসবুক -এর শরণাপন্ন হয় ওমুক ছেলেটি। তমুক ছেলেটির নাম - ছবি ভাঁড়িয়ে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলে। ফেসবুক-এ দিন হয়, ফেসবুক -এই রাত। ফেসবুক -এ রেখেঢেকে কথা বলতে হয় না। এ আমির আবরণকে ছাপিয়ে অনেক দূর চলে যাওয়া চলে। আমি আড়ালে গুটিসুটি মারে অন্য আমি। কিছুদিনের মধ্যেই অমুক ছেলেটি বুঝে যায় তার মনের মানুষীর ফেসবুক অ্যাকাউন্টের আড়ালে আছে তারই এক বান্ধবী। বান্ধবীটি আবার তমুক ছেলেটির জন্য পাগল, তাই ফেসবুক -এ ভাব পাতানোর চেষ্টায় আছে। ফেসবুক -এর রাজত্বে এ ধরনের ফেক আইডেন্টিটির চল আছে। এই সিনেমার ক্যাচলাইনেও তার অনুমোদন— ফেক ইট ইফ ইউ কান্ট মেক ইট! ফেক আর রিয়েলের আড়ালে ভ্রান্তিবিলাস চলতে থাকে জমে ওঠে রোমান্স। শেষমেশ ভ্রান্তিমোচন হয়। ফ্রান্ডশিপের অর্থ আমাদের মগজে ঢোকে। ফ্রেন্ডশিপের ভেক ধরে ফলস অ্যাকাউন্ট খুলে পছন্দসই সই পাতানোর খেলার নামই তবে ফ্রান্ডশিপ, এই তো! এই সুযোগে বাবালোগদের মন ভজানোর জন্য যা পণ্য প্রয়োজন সব কিছুর ব্রান্ড প্রোমোশন হতে থাকে সিনেমার পর্দায়। মধুরেণ সমাপয়েৎ ঘটে। মৃণাল সেনের 'অকাশ - কুসুম' -এ যা ছিল না, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরির 'অন্তহীন' -এ যা হতে হতেও হয়নি, নূপুর আস্থানা'র 'মুঝসে ফ্রান্ডশিপ করোগে'তে তাই সম্ভব হয়।

হালকা ফুরফুরে মেজাজে বানানো আগমার্কা বলিউড সিনেমাও কীভাবে পরিবর্তন শীল যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে চিনে ফেলে সেগুলিকে বাণিজ্যিক ছকে ঢালাই করে নেয়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ একটি। আমাদের মালিনী মুর্মুকে এবার চিনতে পারছি কী? বলিউডের মেক - বিলিভ বিশ্বের বাসিন্দা তিনি নন। অথচ উদারনীতির পথে হেঁটে চলা একটি উন্নয়নশীল দেশে যে বিত্তসর্বস্ব মধ্যবিত্ত শ্রেমির উদ্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে তাঁকে পাব আমরা। এখানে অবিরাম আড্ডা আছে। অনাবিল ফুর্তি আছে। অপারগ মনও আছে।

গ্রামের চণ্ডীমন্ডপের চাপানউতোর একদিন রাস্তার ধারের রকে আড্ডা হয়ে উঠেছিল। কালে কালে সে আড্ডা চায়ের দোকানে, কফি হাউসে, বারিস্তাতে বহুরূপে সম্মুখে এসেছে। এইসব আড্ডায় মুখোমুখি বসিবার একটি অনিবার্যতা ছিল, এখনও আছে। রমা রায়কে মনে আছে। অফিসের সোশ্যালে, অ্যামেচার নাটকে অভিনয় করতেন যিনি, সেই রমা রায়? গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার - সুপর্ণকান্তি ঘোষ - মান্না দে'র ত্রিবেণী সঙ্গমে বাঙালি আড্ডার যে মধুমাসের উদযাপন, তাতে রমা রায় একটি উজ্জ্বল চরিত্র। একদিন কাকে যেন ভালোবেসে আঘাত পেয়ে শেষমেশ পাগলা গারদে ঠাঁই হয়েছিল রমা রায়ের। মাঝে মাঝে ভাবি, রমা রায়ের সেই প্রার্থিত পুরুষটি যদি কফি হাউসে এসে নিখিলেশ, মঈদুল, ডি'সুজা, অমলদের সমানে দাঁড়িয়ে রমা রায়ের সম্পর্কে অকথা - কুকথার বন্যা বইয়ে দিতেন, এক ঘর চেনাপরিচিতের সমানে রমা রায়কে উদোম করে দিতেন, কেমন লাগত রমা রায়ের? খারাপ লাগত, সন্দেহ নেই। অকাতর রক্তক্ষরণ হত অন্তঃস্থল থেকে। তবু শুশ্রূষা পেতেন তিনি ছয় আড্ডাবাজ বন্ধুর কাছে। হয়তো ঘুরেও দাঁড়াতেন। আড্ডাটা না থাকায়, রমা রায়ের আর ঘুরে দাঁড়ানো হল না। শিল্পী তিনি, সংবেদনশীল তিনি। আঘাত তাঁর স্নায়ুকে অগোছালো করে দিল।

ফেসবুক -এ আড্ডা আছে। কিন্তুমুখোমুখি বসিবার অবকাশ নেই। অবমাননা আছে। বিশ্বাসঘাতকতা আছে। অন্তর্গত অনেক রক্তক্ষরণ আছে। কিন্তু শুশ্রূষা নেই। সান্ত্বনা নেই। গোপনীয়তা নেই। সাপোর্ট সিস্টেম নেই। ডিফেন্স মেকানিজম নেই। তাই পুরনো গিটার ফেলে লাকি আলিকে পাঠানো ফ্যানমেলের পালা সাঙ্গ করে, সিলিং-এর দিকে চোখ গিয়েছিল মালিনীর। প্রতিশোধের কথা ভুলে প্রায়শ্চিত্ত করার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর।

ওই একটি মুহূর্তে চুনী কোটালের সঙ্গে তাঁর কোনও ফারাক ছিল না।